১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ ২.০

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার
নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা

bwged

বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

সূচনা

ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি কৌশলগত পণ্য, কারণ এটির অভাব বা মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য সকল খাতকে প্রভাবিত করে। বিগত সরকারের ভুল নীতি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে পতনের দ্বারে নিয়ে গেছে । যে খাত রাষ্ট্রের শক্তিশালী সম্পদ হওয়ার কথা ছিল, তা এখন বোঝায় পরিণত হয়েছে।

আশার কথা যে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম :

১. জ্বালানি ও বিদ্যুতের দ্রুত সরবরাহ বিশেষ আইনের মত একটি কালাকানুন স্থগিত করা হয়েছে।
২. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনের সংশোধনী বাতিল করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা বিইআরসি-এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।
৩. বিগত সরকারের আমলে মেয়াদ বৃদ্ধি করা ১২টি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।
৪. বিগত সরকারের আমলে তড়িঘড়ি করে অনুমোদন দেয়া ৩১টি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। এবং
৫. বছরে চার বার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। এবং
৬. জ্বালানি ও বিদ্যুতের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে।

আমরা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের জন্য কয়েকটি দাবি তুলে ধরছি।

জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা

জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা

বিগত ১৬ বছরে প্রধানত তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে : (১) যে কোনো উপায়ে কয়েকটি গোষ্ঠীকে জ্বালানি খাত থেকে লুঠের সুযোগ করে দেয়া; (১) নীতি প্রণয়নে তহবিল-দাতা দেশের স্বার্থ রক্ষা করা, (২) জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলনে বাহবা নেয়া। এ কারণেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ-সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও পরিকল্পনাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এবং কখনও কখনও এগুলো পরস্পরবিরোধী।

১. ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন’-এর আওতায় কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই খেয়ালখুশিমত প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়। এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের আদালতে যাবার অধিকারও খর্ব করা হয়।

২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন-ক্ষমতার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়ন করার কথা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা ২০২৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়। তবে, এ খাতে কখনওই বিদ্যুতের ২.৯ শতাংশের বেশি বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

৩. ২০২১ সালে প্রণীত মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। অথচ জাপানের স্বার্থে ২০২৩ সালের ‘সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় (IEPMP) এ ২০৫০ সাল নাগাদ মাত্র ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আমদানিকৃত ভুয়া প্রযুক্তি থেকে ২৩ শতাংশ চাহিদা পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. ২০২২ সালে প্রণীত খসড়া ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি’তে ২০৩০ সাল নাগাদ মাত্র ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আমাদের দাবি
(জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা)

১. অবিলম্বে ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন’ বাতিল করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া যৌক্তিক, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। এতে নবায়নযোগ্য উৎসের বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ দ্রুত কমে যাবে।

২. যত দ্রুত সম্ভব জাইকা প্রণীত ‘সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (IEPMP) বাতিল করে দেশীয় জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে জ্বালানি নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতি বিবেচনায় নিয়ে ‘জ্বালানি নীতি’ ও ‘জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা’ গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে কী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় তার একটি রূপরেখা পাওয়া যাবে।

৩. ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নীতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করার লক্ষ্যে স্বাধীন ‘জাতীয় জ্বালানি কমিশন’ গঠন করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ করে সমন্বিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এ বছরের মধ্যে খসড়া ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি’ চূড়ান্ত ও অনুমোদন করতে হবে যাবে ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

জীবাশ্ম জ্বালানি

জীবাশ্ম জ্বালানি

ইতোমধ্যে ২৪,২৪২ মেগাওয়াট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও এলএনজি) বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যদিও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৬,৪৭৭ মেগাওয়াট। ফলে, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ৫৬ শতাংশ সময় অলস বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, শুধুমাত্র বিদ্যুৎ খাতের জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার (৬১,০০০ কোটি টাকা) বা মাসে ৫০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যাচ্ছে। এরপরও বিদ্যুৎখাতের জ্বালানি চাহিদার মাত্র ৪৫ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। জ্বালানির ব্যবস্থা না করেই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৮-১০ বছর আগে কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ স্বাক্ষর করা হয়েছে। পিপিএ স্বাক্ষরের ৩৬-৪৪ মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা থাকলেও এসব গত ১০ বছরেও উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। অথচ, তাদের পিপিএ বহাল রাখা হয়েছে। যেমন : লিবার্টি পাওয়ারের ফে
এঃ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট, মাইশা গ্রুপের ঢাকা সাউথ ১০০ মেগাওয়াট, সিকদার গ্রুপের খুলনা ১০০ মেগাও
কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র ছয় মাস উৎপাদন না করতে পারলে তাদের বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি (পিপিএ) বাতিল হয়ে যাবার বিধান আছে। কিন্তু সিএলসি পাওয়ারের বসিলা ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ৪ বছর ৯ মাস এবং পাওয়ারপ্যাকের জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ২ বছর ১০ মাস ধরে বন্ধ। কিন্তু এদের পিপিএ বাতিল হয়নি।

দেশে ‘কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট’ ও ‘মার্চেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট’ নির্মাণ ও ‘নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট (NENP)’ নীতির আওতায় বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিধান থাকলেও ‘ক্যাপাসিটি চার্জ’সহ আইপিপি নির্মাণ করা হয়েছে যা এ বছর ২৮ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাপাসিটি চার্জ (১৭ বছর)

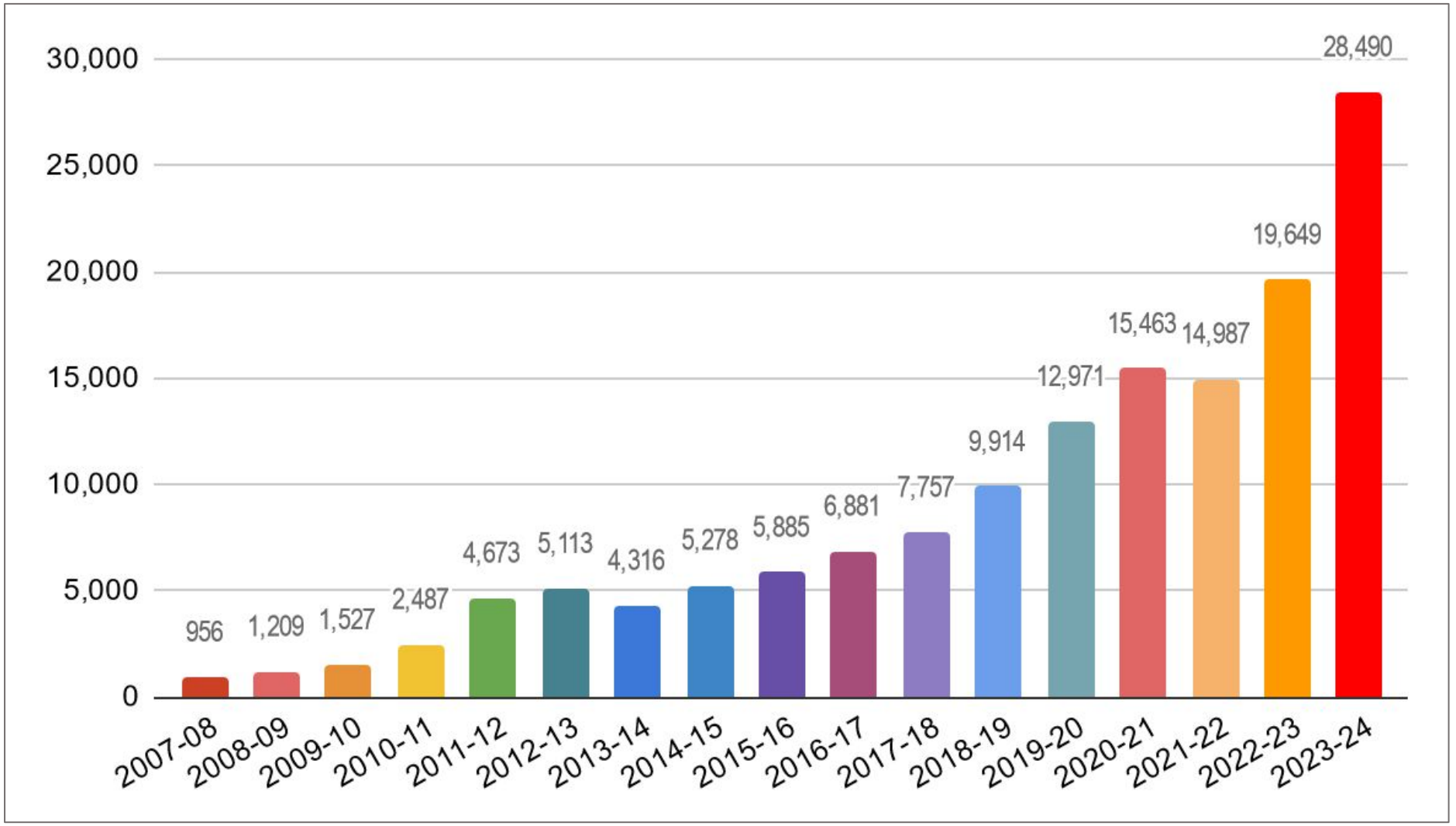

Total (2007-08 – 2023-24: BDT 1,47,556.38 Crore)

আমাদের দাবি
(জীবাশ্ম জ্বালানি)

১. অবিলম্বে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে অচল বিদ্যুৎকেন্দ্রের (বিশেষত বসিলা ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র) পিপিএ বাতিল করতে হবে যাতে বিদ্যুৎখাতে অতি-সক্ষমতার বোঝা কমে আসে।

২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজার সম্পন্ন এবং উৎপাদন শুরু করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে হবে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারলে বিদ্যুতের মূল্য পরিমার্জন করতে হবে।

৩. জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'ক্যাপাসিটি চার্জ' বাতিল করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতোই 'নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট' নীতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৪. অতি-দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর 'কার্বন কর' বা 'দূষণ কর' ধার্য করতে হবে। এ কর থেকে আদায়কৃত অর্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৫. জ্বালানি রূপান্তর ও দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ কোনো ক্রমেই সম্প্রসারণ করা হবে না এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

কয়লাবিদ্যুৎ

২০২১ সাল নাগাদ পৃথিবীর অধিকাংশ বহুপাক্ষিক ব্যাংক (বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এইআইআইবি), বহুজাতিক ব্যাংক (এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, সিটি গ্রুপ) এবং দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতা দেশ (চীন, কোরিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কয়লাখাতে ঋণ দেয়া বন্ধ করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট কয়লা-বিদ্যুতের দাম পড়েছে ১৫.২০ টাকা যার মধ্যে ১০.৭২ টাকাই কয়লা আমদানির ব্যয়। এ বছর উৎপাদন খরচ ১৭ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বৈশ্বিক বাজার ও ডলারের বিনিময় মূল্যের কারণে ভবিষ্যতে ব্যয় আরও বাড়বে।

কয়লা দিয়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করলে প্রায় এক কেজি কার্বন নির্গত হয়। এছাড়া অন্যান্য দূষণে স্বাস্থ্য ও ফসলের ক্ষতি হয় প্রায় সাড়ে তিন টাকা।

বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আর কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবেন না বলে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এছাড়া, খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করবেন না বলেও অঙ্গীকার করেছিলেন।

কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আইইপিএমপিতে ৬,৮০০ মেগাওয়াট নতুন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে বিপিডিবি'র মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ওরিয়ন গ্রুপের মাতারবাড়ি ৬৩৫ মোগওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র অন্যতম।

২০১৬ সালে পিপিএ স্বাক্ষর করে ২০২২ সালে উৎপাদন শুরু করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ওরিয়ন নির্মাণকাজই শুরু করতে পারেনি। ২০২৮ সালেও এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদন শুরু করলে ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য নির্গমন নিশ্চিত করা সম্ভব না।

প্রতি ইউনিট কয়লা-বিদ্যুতের উৎপাদনমূল্য

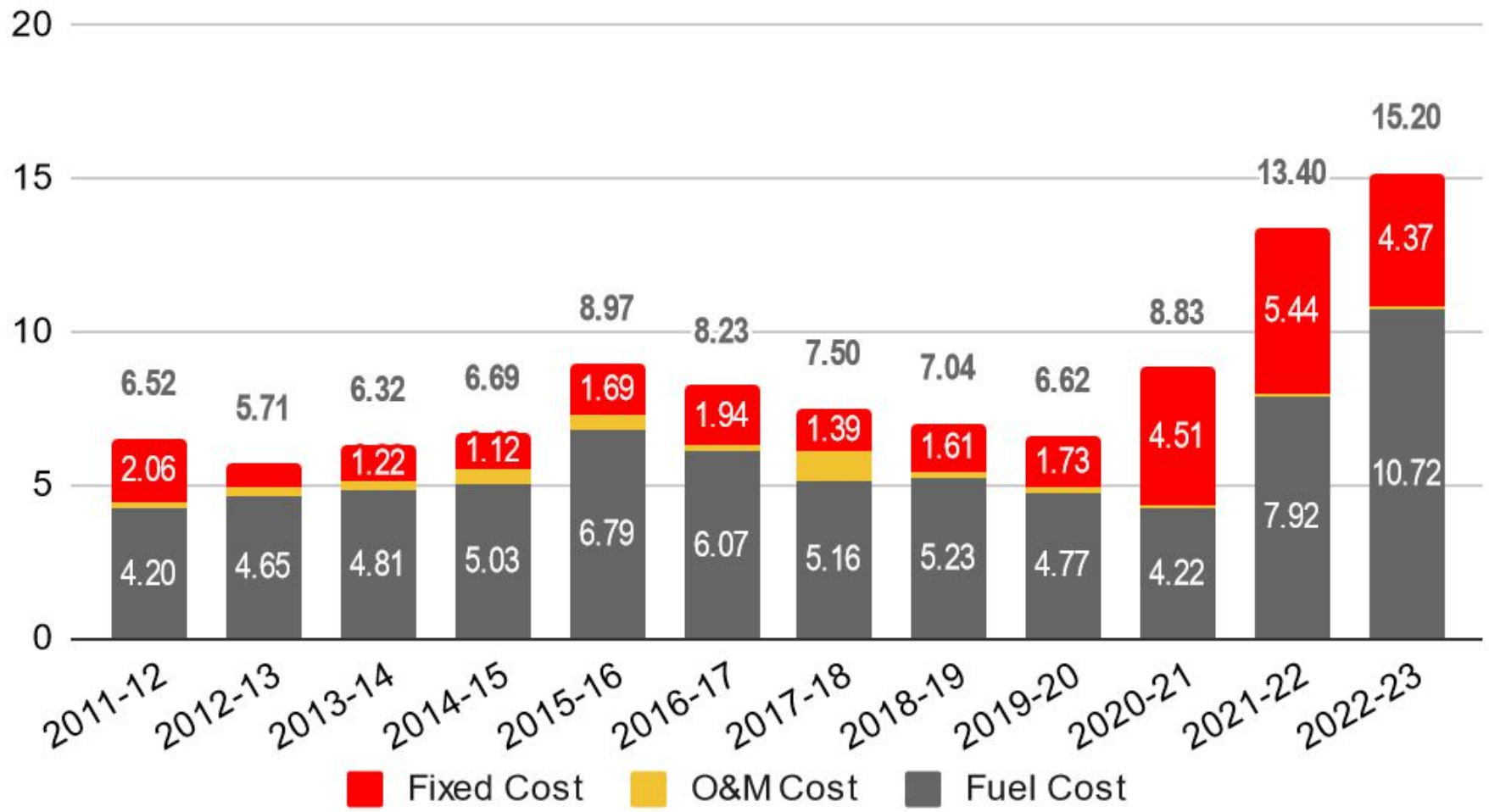

আমাদের দাবি
(কয়লাবিদ্যুৎ)

১. অবিলম্বে ‘কয়লা বন্ধের নীতি’ (No Coal/ Coal Moratorium Policy) গ্রহণ করতে হবে যা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে, এবং আমাদের বিদ্যুতের গড় দাম কমিয়ে আনবে।
২. আইইএমপি থেকে নতুন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। একই সঙ্গে বিপিডিবি’র প্রস্তাবিত মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন, মাতারবাড়ির ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশ, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর কয়লা-দূষণের মারাত্মক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ওরিয়ন ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ বাতিল করতে হবে।
৪. আইইপিএমপি থেকে বড়-পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও খালাসপীর কয়লাখনিসহ সকল কয়লাখনির প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।
৫. কয়লা-বিদ্যুতের জন্য অধিগ্রহণকৃত, তবে অব্যবহৃত ১৫ হাজার ৩০০ একর জমিতে সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ স্থাপন করতে হবে। এখানেই প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

[**অব্যবহৃত ভূমি :** মহেশখালী পাওয়ার হাব : ৫,৫১৮ একর, মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ১,১৫০ একর, কোহেলিয়া কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ১,৩৫০ একর, পায়রা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ৪১৫ একর, পটুয়াখালী কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ৯২৫ একর, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ৯৩৮ একর ও পায়রা সমুদ্রবন্দর : ৫,০০০ একর]

জীবাশ্ম গ্যাস ও এলএনজি

নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। ২০১০ সালেই এ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ না নিয়ে নতুন নতুন গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়।

ঘাটতি পূরণ করার জন্য বেসরকারি খাতে দুটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় যাদেরকে প্রতিদিন ৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে। এরপরেও চাহিদার ৫০ শতাংশও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, প্রতিদিন অর্ধেকেরও বেশি গ্যাসবিদ্যুৎকেন্দ্র অলস পড়ে থাকছে।

প্রতি ঘনমিটার এলএনজি কিনতে ব্যয় হয় ৬১.৪২ টাকা যা বিদ্যুৎ খাতে ১৪.৭৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। ফলে, প্রতি ঘনমিটারে লোকসান হয় ৪৬.৬৭ টাকা। তাহলে বিদ্যুৎখাতে প্রতি বছর ব্যবহৃত ৬৫০ কোটি ঘনমিটার গ্যাসে সরকারের ক্ষতি হয় ৩০,৩৩৮ কোটি টাকা।

ইতোমধ্যে ২টি এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে যাদের স্থাপিত ক্ষমতা ১,১৬৭ মেগাওয়াট, এছাড়া ২টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে যাদের ক্ষমতা ১,৫১৮ মেগাওয়াট। এই ৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে প্রতিদিন ৪৪.২১ কোটি ঘনফুট গ্যাস লাগবে, যার আসলে কোনো উৎস নেই। ফলে, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে।

এরই মধ্যে বিগত সরকার ৩টি এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের (১,৭৭০ মেগাওয়াট) নীতিগত অনুমোদন ও আগ্রহপত্র (LOI) দিয়ে গেছে। যেমন : মীরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট (কনফিডেন্স) বিদ্যুৎকেন্দ্র, গজারিয়া (এডরা) ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট (আনলিমা) বিদ্যুৎকেন্দ্র। এগুলো নির্মাণ করা আমাদের অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী হবে।

এলএনজি আমদানি ব্যয় (টাকা/ঘনমিটার)

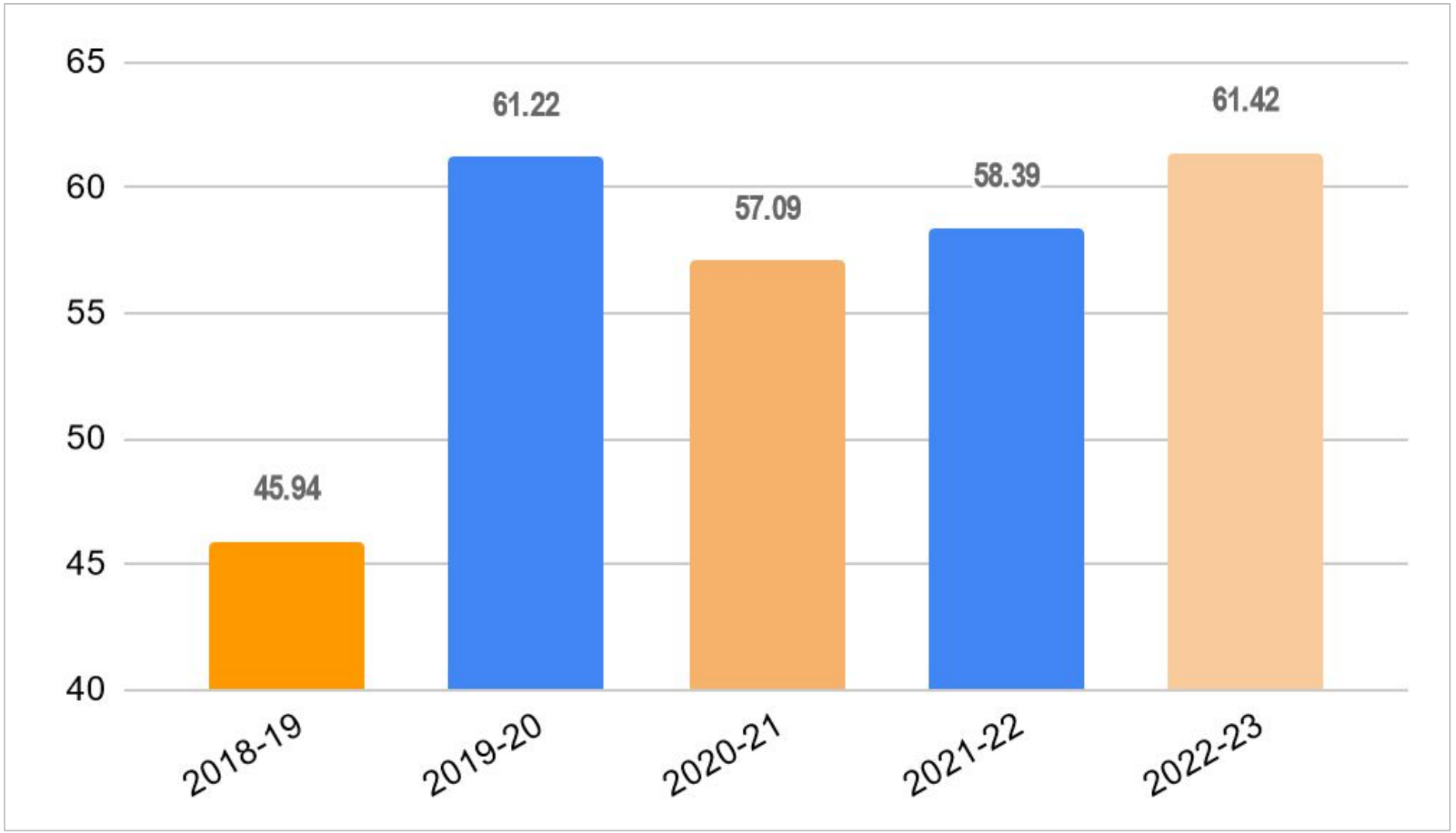

আমাদের দাবি
(জীবাশ্ম গ্যাস ও এলএনজি)

১. অবিলম্বে এলওআই প্রদানকৃত তিনটি এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করতে হবে। এছাড়া, চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজার ঘোষণা করতে না পারার কারণে ইউনাইটেড গ্রুপের আনোয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ বাতিল করতে হবে।

২. পুরোপুরি আমদানি-নির্ভর বিধায় আইইপিএমপি থেকে নতুন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। এছাড়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকার কারণে নতুন কোনো এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না।

৩. আগামী বছরের শেষ নাগাদ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর চাপ কমে আসবে। তাই, নতুন গ্যাস-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করলে বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের ব্যবহার কমে আসবে।
উ
দ্ত্ত গ্যাস শিল্প ও সার উৎপাদনে ব্যবহারে করলে তা একদিকে জ্বালানি খাতে লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে আনবে, অন্যদিকে জাতীয় অ

৪. নীতিগত অনুমোদন দেয়া সামিট গ্রুপের দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এবং এক্সলেরেট এনার্জি'র প্রস্তাবিত পায়রা এলএনজি টার্মিনাল বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছি।

ভুয়া প্রযুক্তি

ভুয়া প্রযুক্তি
(সিসিএস, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন)

দেশে পর্যাপ্ত সৌরবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, বিদ্যুৎ খাতের কার্বন নির্গমন কমানোর নামে আইইপিএমপিতে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) কতগুলো ভুয়া প্রযুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে। এগুলো হলো : কার্বন সংরক্ষণ ও স্টোরেজ (সিসিএস), অ্যামোনিয়া ও তরল হাইড্রোজেন।

এ প্রযুক্তিগুলোর প্রত্যেকটিই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশেই কার্বন নির্গমন কমানোয় পরীক্ষিত প্রযুক্তি হিশেবে প্রমাণিত নয়। এমনকি, ২০২৩ সালের জি-৭ সম্মেলনে এ জোটের সদস্য দেশগুলোও জাপানের এ প্রযুক্তি গ্রহণে রাজি হয়নি।

কিন্তু বিগত সরকার কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই জাপানের প্রস্তাবিত ভুয়া প্রযুক্তি আইইপিএমপিতে গ্রহণ করেছে।

এ প্রযুক্তিগুলো গ্রহণ করলে তা বাংলাদেশকে জ্বালানির ক্ষেত্রে আরো আমদানি-নির্ভর করে তুলবে। প্রতিটি প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বিদ্যুতের উৎপাদন-খরচ বেড়ে যাবে এবং বাংলাদেশ কখনওই দূষণমুক্ত সবুজ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। তাই :

১. যত দ্রুত সম্ভব আইইপিএমপি থেকে সিসিএস, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের মত ভুয়া প্রযুক্তি বাদ দিতে হবে।

২. এসব অতি-খরুচে জ্বালানি-প্রযুক্তি বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করার জন্য জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এবং

৩. মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো আইইপিএমপি গ্রহণ ও অনুমোদনের সঙ্গেও দুর্নীতি জড়িত কি না তা তদন্ত করতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বিগত সরকারের আমলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে নানা রকম পরিকল্পনা শোনা গেলেও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি, বরং নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্রুত প্রবর্তনে নান ধরনের বাধা কার্যকর ছিল পুরো ১৬ বছর জুড়ে।

১. মোট জ্বালানির ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হলেও জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ২.৯ শতাংশ।
২. সর্বশেষ অর্থ বছরে (২০২৪-২৫) চাহিদার তুলনায় শিশিরবি
নদু-তুল্য ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যেখানে একটি ১ হাজার মেগাওয়াট কয়লা-বি
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপর ২৫.৫ থেকে ৫৬.৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি ও অন্যান্য শুল্ক ধার্য করে রাখা হয়েছে যা জনসাধারণ ও ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় বাধা।
৪. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-কে মাত্র ১০ মেগাওয়াট পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপন, মেরামত, পুনর্নবায়ন ও ব্যবসা পরিচালনায় লোকবল তৈরির জন্য কোনো প্রশিক্ষণ বা বিনিয়োগ করা হয়নি।
৬. একদিকে অদক্ষ ও অভিজ্ঞতাহীন কোম্পানিগুলোকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতির লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এত বেশি দাম ধরা হয়েছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা গড়পড়তা সব অনুমোদিত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছেন যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সাশ্রয়

1 MW of Solar Photovoltaics can generate 16,20,600 annually at a rate of 18.5%

Source	Generation	Fuel Price (kWh)	Total Price (BDT Crore)
HFO	1,620,600.00	16.10	2.61
Solar	1,620,600.00	---	---
		Difference	**2.61**

আমাদের দাবি
(নবায়নযোগ্য জ্বালানি)

১. বাতিলকৃত নবায়নেযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে উ
ন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যারা ইতোমধ্যে বিনিয়োগ করে ফেলেছেন তাদের ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। এসব প্রকল্পে জোরপূর্বক
২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপর ধার্য সকল কর মওকুফ করতে হবে যাবে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষাকৃত সস্তায়
ক্ষুদ্র ছাদভিত্তিক, ভাসমান, কৃষিভিত্তিক ও সৌরবিদ্যুৎ-চালিত সেচব্যবস্থা চালু করতে পারেন। প্রতি ১ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন কর
৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বাজেট থেকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দ করতে হবে। আপাতত, এ বছরের জন্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে থোক বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি টাকা করতে হবে।
৪. স্রেডার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ‘বিদ্যুৎ বিভাগ’-এর সমতুল্য করতে হবে; অথবা, বিদ্যুৎ বিভাগের সমান্তরাল একটি ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ’ গঠন করতে হবে।
৫. ব্যক্তি পর্যায়ে ছাদভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভর্তুকি দিতে হবে যা চূড়ান্ত বিচারে গ্রিডের উপর চাপ কমাবে এবং বিনামূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করবে।
৬. বড় সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ যাতে বড় গ্রাহকদের কাছে সরাসরি বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারেন সে জন্য ভার্চুয়াল পিপিএ স্বাক্ষর ও ভার্চুয়াল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রবর্তনের বিধান করতে হবে।
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গবেষণা ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

পরিবহন খাত

বিগত সরকারের আমলে একদিকে ২০৫০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ ব্যক্তিগত গাড়ি ও ১০ শতাংশ বাস-ট্রাক বৈদ্যুতিক গাড়িতে (ইভি) রূপান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে, অন্যদিকে ইভি ও সাধারণ গাড়ির শুল্ককর, রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফি একই রাখা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই দেশে প্রচুর নাগরিক হাইব্রিড গাড়ি কিনছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ইভি ও প্লাগইন হাইব্রিড গাড়ির প্রচলন খুবই কম। কারণ :

১. ইভি ও প্লাগইন হাইব্রিড গাড়ির উচ্চমূল্য বিবেচনায় নিয়ে শুল্ককর ও রেজিস্ট্রেশন ফিতে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি।
২. দেশে মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক চার্জিং স্টেশন নেই।
৩. প্লাগইন হাইব্রিড বা ইভি মেরামত ও যন্ত্রাংশ সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বা অবকাঠামো নেই।

তাই, আমাদের দাবি : ইভি ও প্লাগইন হাইব্রিড গাড়িকে যানবাহনের দৃষ্টিতে না দেখে বরং জ্বালানি আমদানি কমানোর একটি উপায় হিসেবে দেখতে হবে এবং :

১. হাইব্রিড গাড়ির শুল্ককর ও রেজিস্ট্রেশন ফি সাধারণ গাড়ির তুলনায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কম এবং ইভির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কম নির্ধারণ করতে হবে।
২. দেশে পর্যাপ্ত চার্জিং স্টেশন নির্মাণের স্বার্থে সহজ শর্তে নতুন চার্জিং স্টেশনের অনুমোদন দেয়ার পাশাপাশি প্রচলিত পেট্রোল পাম্প ও রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোকে নতুন লাইসেন্স ছাড়াই চার্জিং স্টেশনে রূপান্তরের নীতি গ্রহণ করতে হবে। এবং
৩. বৈদ্যুতিক গাড়ি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংযোজনের জন্য জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দাবিসমূহ

১. অবিলম্বে ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন’ বাতিল করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া যৌক্তিক, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। এতে নবায়নযোগ্য উৎসের বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ দ্রুত কমে যাবে।

২. যত দ্রুত সম্ভব জাইকা প্রণীত ‘সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (IEPMP) বাতিল করে দেশীয় জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে জ্বালানি নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতি বিবেচনায় নিয়ে ‘জ্বালানি নীতি’ ও ‘জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা’ গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে কী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় তার একটি রূপরেখা পাওয়া যাবে।

৩. ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নীতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করার লক্ষ্যে স্বাধীন ‘জাতীয় জ্বালানি কমিশন’ গঠন করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ করে সমন্বিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এ বছরের মধ্যে খসড়া ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি’ চূড়ান্ত ও অনুমোদন করতে হবে যাবে ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

৫. অবিলম্বে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে অচল বিদ্যুৎকেন্দ্রের (বিশেষত বসিলা ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র) পিপিএ বাতিল করতে হবে যাতে বিদ্যুৎখাতে অতি-সক্ষমতার বোঝা কমে আসে।

৬. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজার সম্পন্ন এবং উৎপাদন শুরু করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে হবে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারলে বিদ্যুতের মূল্য পরিমার্জন করতে হবে।

৭. জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের ‘ক্যাপাসিটি চার্জ’ বাতিল করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতোই ‘নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট’ নীতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮. অতি-দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর ‘কার্বন কর’ বা ‘দূষণ কর’ ধার্য করতে হবে। এ কর থেকে আদায়কৃত অর্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৯. জ্বালানি রূপান্তর ও দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ কোনো ক্রমেই সম্প্রসারণ করা হবে না এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১০. অবিলম্বে ‘কয়লা বন্ধের নীতি’ (No Coal/ Coal Moratorium Policy) গ্রহণ করতে হবে যা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে, এবং আমাদের বিদ্যুতের গড় দাম কমিয়ে আনবে।
১১. আইইএমপি থেকে নতুন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। একই সঙ্গে বিপিডিবি’র প্রস্তাবিত মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।
১২. জলবায়ু পরিবর্তন, মাতারবাড়ির ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশ, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর কয়লা-দূষণের মারাত্মক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ওরিয়ন ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ বাতিল করতে হবে।
১৩. আইইপিএমপি থেকে বড়-পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও খালাসপীর কয়লাখনিসহ সকল কয়লাখনির প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।
১৪. কয়লা-বিদ্যুতের জন্য অধিগ্রহণকৃত, তবে অব্যবহৃত ১৫ হাজার ৩০০ একর জমিতে সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ স্থাপন করতে হবে। এখানেই প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।
১৫. অবিলম্বে এলওআই প্রদানকৃত তিনটি এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করতে হবে। এছাড়া, চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজার ঘোষণা করতে না পারার কারণে ইউনাইটেড গ্রুপের আনোয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ বাতিল করতে হবে।
১৬. পুরোপুরি আমদানি-নির্ভর বিধায় আইইপিএমপি থেকে নতুন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। এছাড়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকার কারণে নতুন কোনো এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না।
১৭. আগামী বছরের শেষ নাগাদ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর চাপ কমে আসবে। তাই, নতুন গ্যাস-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করলে বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের ব্যবহার কমে আসবে।
উ
দ্ত্ত গ্যাস শিল্প ও সার উৎপাদনে ব্যবহারে করলে তা একদিকে জ্বালানি খাতে লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে আনবে, অন্যদিকে জাতীয় অ
১৮. নীতিগত অনুমোদন দেয়া সামিট গ্রুপের দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এবং এক্সলেরেট এনার্জি’র প্রস্তাবিত পায়রা এলএনজি টার্মিনাল বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছি।
১৯. যত দ্রুত সম্ভব আইইপিএমপি থেকে সিসিএস, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের মত ভুয়া প্রযুক্তি বাদ দিতে হবে।
২০. এসব অতি-খরুচে জ্বালানি-প্রযুক্তি বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করার জন্য জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।
২১. মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো আইইপিএমপি গ্রহণ ও অনুমোদনের সঙ্গেও দুর্নীতি জড়িত কি না তা তদন্ত করতে হবে।

২২. বাতিলকৃত নবায়নেযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে উ
ন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যারা ইতোমধ্যে বিনিয়োগ করে ফেলেছেন তাদের ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। এসব প্রকল্পে জোরপূর্বক

২৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপর ধার্য সকল কর মওকুফ করতে হবে যাবে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষাকৃত সস্তায়
ক্ষুদ্র ছাদভিত্তিক, ভাসমান, কৃষিভিত্তিক ও সৌরবিদ্যুৎ-চালিত সেচব্যবস্থা চালু করতে পারেন। প্রতি ১ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন কর

২৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বাজেট থেকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দ করতে হবে। আপাতত, এ বছরের জন্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে থোক বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি টাকা করতে হবে।

২৫. স্রেডার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ‘বিদ্যুৎ বিভাগ’-এর সমতুল্য করতে হবে; অথবা, বিদ্যুৎ বিভাগের সমান্তরাল একটি ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ’ গঠন করতে হবে।

২৬. ব্যক্তি পর্যায়ে ছাদভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভর্তুকি দিতে হবে যা চূড়ান্ত বিচারে গ্রিডের উপর চাপ কমাবে এবং বিনামূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করবে।

২৭. বড় সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ যাতে বড় গ্রাহকদের কাছে সরাসরি বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারেন সে জন্য ভার্চুয়াল পিপিএ স্বাক্ষর ও ভার্চুয়াল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রবর্তনের বিধান করতে হবে।

২৮. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গবেষণা ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

২৯. হাইব্রিড গাড়ির শুল্ককর ও রেজিস্ট্রেশন ফি সাধারণ গাড়ির তুলনায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কম এবং ইভির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কম নির্ধারণ করতে হবে।

৩০. দেশে পর্যাপ্ত চার্জিং স্টেশন নির্মাণের স্বার্থে সহজ শর্তে নতুন চার্জিং স্টেশনের অনুমোদন দেয়ার পাশাপাশি প্রচলিত পেট্রোল পাম্প ও রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোকে নতুন লাইসেন্স ছাড়াই চার্জিং স্টেশনে রূপান্তরের নীতি গ্রহণ করতে হবে। এবং

৩১. বৈদ্যুতিক গাড়ি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংযোজনের জন্য জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধন্যবাদ

+88 01976 702 0065 | info@cleanbd.org
https://cleanbd.org | https://energytransitionbd.org